অন্তরের শুদ্ধতম চিত্রকর : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

শিল্পীদের জীবনকাহিনি নিয়মিত শুনিয়ে আসছেন দেবকুমার সোম। এবার তিনি শোনাচ্ছেন শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ছবি-জীবন।

"প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে কতকগুলো ছায়া ঘুরে বেড়ায় – মৃত্যুর ছায়া, রোগ-শোকের ছায়া, অপমান-লাঞ্ছনার ছায়া ইত্যাদি নানা ছায়া সদা সাথীর মতো সর্বদা আমাদের অনুসরণ করছে। আমি জন্মেছিলাম সামনে লম্বা অনিশ্চিতের ছায়া নিয়ে। এই ছায়ায় আমাদের পরিবারের সকলের মন আচ্ছন্ন হয়ে ছিল অনেকদিন পর্যন্ত। সকলেরই চিন্তা কি হবে এই ছেলের! মা বলেছিলেন, 'ও ছেলে নিজের ভাত কাপড় ক'রে খাবে, তোদের কোনো চিন্তা নেই।' ডাক্তার বলেছে ছেলে অন্ধ হয়ে যাবে, মোটা চশমা চোখেও ইস্কুলে যার স্থান হচ্ছে না তার কি হবে? 'করে খাবে' – এ হল মা'র মনের আন্তরিক ইচ্ছা।" : – চিত্রকর।

দীর্ঘ ছায়াগুলো আষ্টেপৃষ্ঠে তাঁকে জড়িয়ে ছিল জন্মাবধি। জন্ম থেকে এক চোখ কানা। অন্য চোখ ভয়াবহ মায়োপিক। প্রায় অস্বচ্ছ দৃষ্টি। পরাধীন দেশের রাজধানী শহরে জন্মে কীভাবে গ্রাসাচ্ছাদন করবেন? এই ভাবনায় কাতর ছিলেন তাঁর গুরুজনেরা। বিশেষত যেখানে বড় দাদা প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, অন্যান্য সহোদরেরা জীবনে প্রায় আর্থিক প্রতিষ্ঠার অভিমুখে, সেখানে বালক বয়সেই যেন হেরে গেছেন তিনি। বিধাতার মার কবে কে খণ্ডন করেছে দুনিয়ায়? তবে বিধাতার ওপর ছেড়ে বসে থাকলে 'পুরুষকার' বলে অভিধানে যে শব্দটি রয়েছে, তার প্রতি সুবিচার করা হয় না। না কি সত্যিই 'পুরুষকার' বলে কিস্যু নেই। নাটক-নভেলে লার্জার দ্যান লাইফ কনটেক্সটেই এর ব্যবহার। চিত্রকর বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ও জ্ঞানত তেমনটাই ভেবে নিলে আজ তাঁকে নিয়ে চর্চার প্রয়োজন ছিল না। সংস্কৃত স্কুলে দশ ক্লাশ অবধি পড়াশুনা করেছেন কোনক্রমে। একটানা নয়, মাঝেমাঝেই ব্যাহত হয়েছে বিদ্যাশিক্ষা। স্কুল পাল্টেছে বরাবর। সবার ছোটো আর শারীরিক দুর্বলতার কারণে তিনি শৈশব থেকে গৃহবন্দী। আত্মমগ্ন। চোখে যত কম দেখেন, রঙিন এই পৃথিবীকে নিজের অন্তরে আর গভীরে মিশিয়ে নিতে তত আকুল-বিকুল হন। শৈশবে

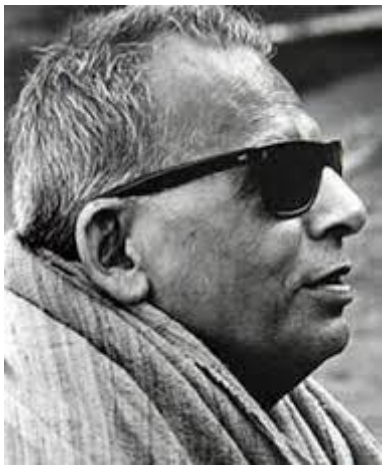

একমনে চেয়ে চেয়ে দেখতেন মুচি কীভাবে জুতো সেলাই করে। ফেরিওলাদের পোষাকের রকমফের। পথচলতি অফিসযাত্রীদের আদব-কায়দা। মেয়েদের চুড়ি পরার কায়দা-কানুন। ছাদের আলসেতে চুন-বালি চটে যাওয়া ফাটল। শৈশবে সঙ্গীহীন জীবনে নিজের ভেতরে আত্মস্থ হচ্ছিল খুব সরল, সাদামাটা এক জীবনগাথা। এই জীবনে কোন দৈববাণী ছিল না সেই কচি বয়েসে। কেবল ছিল মেজদা বিজনবিহারীর সস্নেহ সাহচর্য। বিজনবিহারী তখনও ছাত্র। মনে মনে তাঁর উচ্চাশা শিল্পী হবেন। ওরিয়েন্টাল আর্ট স্কুলের শিল্পীদের মতো সুখ্যাত হবেন। তিনি বিজনবিহারী, কলেজ স্ট্রিটের রেলিঙে টাঙানো অবন ঠাকুর, সুরেন গাঙ্গুলি, প্রিয়নাথ সেন কিংবা নন্দলাল বসুর ছবি কিনতেন। অয়েল পেন্টিং কীভাবে করতে হয় তার কসরত শিখতে চাইতেন। আর এসব দুর্লভ সময়ে তাঁর অনুচর ছিলেন অনুজ বিনোদবিহারী। বিনোদের রক্তে শিল্পচর্চার বীজ বুনে দিয়েছিলেন দাদা বিজনবিহারী। পরিণত বয়সে সে কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন ভাই। বড়দাদা বনবিহারী রেলের চিকিৎসক ছিলেন, সেই সুবাদে তাঁকে গোদাগাড়ির মতো অকুলীন গ্রাম্য জীবনে বদলি হতে হয়। অসুস্থ বিনোদবিহারী সেখানেই স্থিত হন। শহর কলকাতা ছেড়ে সেই প্রথম গ্রাম জীবনে যাওয়া। প্রকৃতির মধ্যে নিজের অবস্থানটি চিহ্নিত করা। জীবনে প্রথম রূপসী বাঙলার প্রেক্ষাপট মনের মুকুরে ভেসে ওঠা।

বিনোদবিহারীর জন্ম ১৯০৪ সালে। তেরো বছর বয়সে তাঁকে তাঁর আর এক দাদা বিমানবিহারীর সঙ্গে যাত্রা করতে হয় বোলপুরে। বিশ্বভারতী। 'রবিবাবু'-র স্কুলে ছাত্র হতে। তাঁর বাড়ির লোকেরা শুনেছিলেন প্রথাগত শিক্ষাদানের বাইরে 'রবিবাবু' ছাত্রদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ততদিনে ক্ষীণ দৃষ্টির কারণে বিনোদবিহারী প্রথাগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। পরিণত বয়সে *চিত্রকর* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারটি শিল্পী নাটকহীনভাবে আমাদের শুনিয়েছিলেন। কিন্তু একথা তো সত্যি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে স্থান না পেলে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে পরবর্তীকালে হয়ত কেউ চিনতেন না। তাঁর জীবনকথা বেঁচে থাকার পাঠ্য হত না। তাই তাঁর এরপরের জীবনকাহিনি চিত্রনাট্য মেনে যথাযত। ১৯১৭ সালে বিশ্বভারতীর ছাত্র হলেন তিনি (দুবছর কম বয়সে তাঁকে ভর্তি করা হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরীক্ষা নিয়েছিলেন। বিনোদবিহারী ততদিনে *মেঘনাদবধ কাব্য* পড়ে ফেলেছেন সে তথ্যও রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বালক বিনোদবিহারীর শারীরিক অক্ষমতার কথা জেনেই তাঁকে ভর্তি করেছিলেন। তাঁর স্থির প্রত্যয় ছিল বিশ্বভারতীর মুক্ত বিদ্যালয়ে কিশলয় বিনোদবিহারী আপন মনেই বেড়ে উঠবেন), ১৯১৯ সালে কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হলে বিনোদবিহারী সেখানেই চালান হলেন। বিনোদবিহারীর আপন ভাষ্যে শুনুন সে সুখকর অভিজ্ঞতার কাহিনি : "সকালে ক্লাসে চলেছি

যথারীতি বই-আসন নিয়ে, এমন সময় ধীরেন্দ্রকৃষ্ণের সঙ্গে শালতলায় আমার সাক্ষাৎ। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ আমাকে বললেন, 'গুরুদেব কলাভবন খুলেছেন, আমরা যারা ছবি আঁকতে চাই, সেখানে যেতে পারি। আমি চলে গেছি, তুমিও চলো। আমার চেয়ে তাঁর উৎসাহ বেশি। তিনি তখনই আমাকে নিয়ে গেলেন তৎকালীন অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রীর কাছে। ক্লাসের বইখাতা ও আসন তখনো আমার হাতে 'কলাভবন' বলে নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে, এ খবর শাস্ত্রীমশাই জানতেন না। যাই হোক বাড়ি থেকে অনুমতিপত্র আনিয়ে দেব, এই প্রতিশ্রুতিতে কলাভবনে যোগ দেবার অনুমতি পেলাম।"

বিনোদবিহারী কলাভবনের ছাত্র। কলাভবনের শিল্পী এবং কলাভবনের শিক্ষক। মাঝে কয়েক মাস জাপানে, বছর দুয়েক নেপালের রাজকার্যে, তৎপরবর্তীকালে সিমলায় স্কুল স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টায় কিছুকাল শান্তিনিকেতনের বাইরে থেকেছেন। এ বাদে তাঁর অন্য সতীর্থ রামকিঙ্করের মতোই তিনি চিরকালের আশ্রমিক। তেরো বছর বয়সে এক চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়া যে কিশোর শান্তিনিকেতনে ভর্তি হয়েছিলেন, তিপান্ন বছর বয়সে সেই আশ্রমিক সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেলেন। এরপর দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর সম্পূর্ণ অন্ধ শিল্পীজীবন। সবটাই শান্তিনিকেতন কেন্দ্রিক। এই পরিণতি শৈশবের ভবিষ্যতবাণীকেই সমর্থন করে। বিনোদবিহারীর চারপাশের মানুষজন জানতেন তিনি ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন। ১৯৫৬ সালে দিল্লীতে চোখের ছানি অপারেশনের ঘটনাটা তাই আকস্মিক ছিল না। কিন্তু জন্ম ইস্তক তাঁকে নিয়ে নিকটজনদের যে উদ্বেগ, সেই উদ্বেগ ফের ফিরে এল পড়ন্ত জীবনে। একজন মানুষ যিনি সারাজীবন এক চোখে (হোক না ক্ষীণ দৃষ্টি) এই পৃথিবীর রং-রূপ আস্বাদন করলেন। নিজের শিল্পকলায় তাকে ব্যক্ত করলেন। সেই মানুষ – ল্যান্ডস্কেপ প্রিয় মানুষ, বাকি জীবন কীভাবে কাটাবেন শিল্প ছাড়া? আর এই উদ্বেগের উল্টো স্রোতে দাঁড়িয়ে বিনোদবিহারী, চিত্রী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় নিজের সঙ্গে কি রফা করেছিলেন সেদিন? *কত্তামশাই* নামের একটি লেখায় সেই অভিজ্ঞতার কথা তিনি বলে গেছেন। "যেদিকেই তিনি দৃষ্টি দেন একই দৃশ্য – কেবল অন্ধকার। নিজের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া ছাড়া কোথাও কোনো প্রকার প্রাণের চিহ্ন নেই। ভাগ্যের লিখন তাঁর কাছে এখন স্পষ্ট। আত্মরক্ষার জন্য এখন তিনি উদ্বিগ্ন। কিছু একটা অবলম্বনের জন্য অগ্রসর হতে গিয়ে তিনি কঠিন ধারালো একটা অবস্থার মধ্যে এসে পড়লেন। অন্ধকার যেমন তাঁর কাছে নতুন – অন্ধকারের এই অভিব্যক্তিও তাঁর কাছে তেমন অপরিচিত। কোথায় তিনি! পথ কোথায়!" তাঁর মাথার ভেতরে যে শিল্পবোধ, ছাত্র-ছাত্রী সান্নিধ্যে তা পূর্ণ হচ্ছিল না। আবার অন্ধত্বকে নির্বিবাদে মেনে নেওয়াও তাঁর নিয়তি নয়। শৈশবে ঝাপসা চোখে দাদাদের ইংরেজি বই থেকে আঁকাবাঁকা হাতে বর্ণ লিপিকরণে শিল্পচর্যার শুরু। তারপর গুরু নন্দলালের বাধা পেরিয়ে হিন্দিভবনের গায়ে ম্যুরাল সৃষ্টি। জাপানে পৌঁছে ক্যালিগ্রাফি শিক্ষা। নেপালের জাতীয় কিউরেটর কিংবা সিমলায় পাহাড়ি পটভূমিতে বিদ্যালয় স্থাপন। এই দীর্ঘ পাঁচ দশক

শারীরিক প্রতিকূলতাকে জয় করে তিনি বারবার সৃষ্টিমুখর হয়েছেন। সেখানে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করেছেন নতুন আঙ্গিক। এমন কীর্তিময় জীবন অন্ধত্বের কারণে ছেড়ে দেবেন? ছেড়ে দেবেন শিল্পের রাজপাট? আবার অন্ধ মানুষ রঙের ব্যবহার করবেন কীভাবে? ছবিতে আলোকে আনবেনই বা কী উপায়? ফলে এতদিনের রং-কালি থেকে সরে গেলেন তিনি। মোম কিংবা মাটি হাতের আঙুলের চাপে অবয়বহীন থেকে অবয়বে উন্নীত করার অধ্যবসায় শুরু হল তাঁর। চোখের সামনে সবটাই অন্ধকার। ছবির জগৎ – আলোর জগৎ। সে জগতে তিনি আগের মতো কর্মকার হবেন কীভাবে? কিন্তু মূর্তি? মূর্তি স্পর্শ চায়। হাতের ছোঁয়ায় জেগে ওঠে এক একটি ভাস্কর্য। যেগুলি তাঁর মনের ভেতরে ভাস্বর। আর এইভাবে ক্রমে ক্রমে শিল্পী বিনোদবিহারী পৌঁছে যাচ্ছিলেন অন্য এক আলোর দেশে। অন্ধ জীবনে চিত্রী থেকে ভাস্কর, তারপরে অরিগ্যামি শিল্পী।

আজকের পণ্যবিশ্বে এই অধ্যাবসায়কে প্রাগৈতিহাসিক বলে ভ্রম হয় আমাদের। আজকের বাংলায় যারা সেলিব্রেটি শিল্পী, তাঁদের লীলাময় জীবন আমাদের চোখের ওপর খোলা রয়েছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, পুরষ্কার কমিটির সদস্য, বিত্তবানের প্রাসাদের দেওয়াল কিংবা বিদেশি আর্ট গ্যালারি তাঁদের জীবনের অভীষ্ট। তাঁরা অনেকেই বিদেশ থেকে চিত্রকলার শিক্ষা নিয়ে এসেছেন। তাঁদের ক্রাফটসম্যানশিপ তুলনারহিত। কিন্তু তাঁদের অনেকের ভেতরের লোভপোকা অন্তর্দৃষ্টি নষ্ট করে দিয়েছে। তাঁরা ভালো মানুষ না হয়েও ভালো শিল্পী। রেখায়-রঙে সেরা। এই চর্যিত জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নিলে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় নামক মিথ হয়ে যাওয়া চিত্রকরকে অনুভব করা যাবে না। তাঁর অতি সুখ্যাত ছাত্র সত্যজিৎ রায় যাকে বলেছেন *ইনার আই*, সেই অন্তরের দৃষ্টি একমাত্র পবিত্র মনের মানুষের থাকে। বিনোদবিহারী যে সময়ের ফসল, সে সময় এই আত্মহনন প্রিয় জাতির মধ্যে পবিত্র মনের মানুষ কোন ব্যতিক্রম ছিল না। এক যৌথ পরিবারে জন্ম হওয়া দৃষ্টিশক্তিহীন শিশু বাড়ির অন্য চক্ষুষ্মান দাদাদের কাছ থেকে আহরণ করছেন শিল্পবোধ। চিত্র শিল্পের কারিকুরি। যে চোখে আলো পৌঁছায় না, সেই চোখ অন্তর থেকে খুঁজে নিয়েছিল আলো। পবিত্র আলো। তাঁর জীবন থেকে একটা লাগসই অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করলে হয়ত বোঝানো যাবে সেই আলো কেমন।

"বর্ষার দিনে শান্তিনিকেতনের ছাত্রাবাসগুলি প্রায় জলে ডুবে যেত, ফুটো ছাদ, ভাঙা জানলা দিয়ে বৃষ্টির ঝাপটা এসে অনেক সময়ে বিছানাপত্র ভিজিয়ে দিয়েছে। বর্ষার এইরকম এক রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়ে আমরা কয়েকজন ছাত্র অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাঁকে আমাদের অসুবিধার কথা জানিয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথ ধীরকণ্ঠে বললেন, 'তোরা বোস, দ্যাখ, আমারও

রাত্রে এই খড়ের ঘরে জল পড়েছে, আমিও সারারাত ঘুমোতে পারিনি। বসে বসে একটা গান লিখেছি। শোন, কিরকম হয়েছে।' এই বলে রবীন্দ্রনাথ গান শুরু করলেন – 'ওগো দুখজাগানিয়া তোমায় গান শোনাব, তাইতো আমায় জাগিয়ে রাখ ...'। গান শেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আর্টিস্ট, কবি – আমাদের একই দশা। কেউ আমাদের দ্যাখে না।' ... সেদিন রাত্রের সমস্ত দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর গান।''

কলাভবনের প্রথম যুগের ছাত্র হিসেবে তাঁকে অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়েছিল। শুরুর দিকে যেমন সরঞ্জামের অভাব ছিল, সমস্যা ছিল খাওয়া-পরার। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে নন্দবাবুর গোঁড়ামি, বিশ্বভারতীর সার্বিক অবক্ষয় এসবও ছিল ক্রিয়াশীল। কিন্তু সেই পর্বে শুধু জানার আগ্রহে, শেখার বাসনায় প্রায় অন্ধ মানুষটা দিনের পর দিন নিবিড় অনুশীলন করে গিয়েছিলেন। কলাভবনের দেওয়ালে, কিংবা চিনাভবনের ছাদে ম্যুরাল সৃষ্টির আগে কতবার যে তা মকশো করেছিলেন, তা কেবল তাঁর স্কেচবুকই সাক্ষ্য। বেনারসের ঘাটের চিত্র, দুন ভ্যালির প্রাকৃতিক দৃশ্য তিনি বারবার এঁকে ছিলেন তাঁর খেরো খাতায়। এর ফলে বিনোদবিহারীর রেখার টান হয়ে উঠেছিল অব্যর্থ। অমোঘ। জীবনে চোখের জ্যোতি যত কমে এসেছে, তাঁর রেখাময় চিত্রভাষ তত প্রখর হয়েছে। চিন এবং জাপানি শিল্পীদের কাছ থেকে ক্যালিগ্রাফি শিখে নেওয়ায় তাঁর কাজে ক্যালিগ্রাফির প্রভাব প্রকট হয়েছিল। অর্থাৎ বলার কথা এই, নন্দবাবুর অন্য ছাত্রদের মতো বিনোদবিহারীও রেখার কারিকুরিতে দড় ছিলেন। ফলে অন্ধত্বে তাঁকে কাবু হতে দেখা যায় না। শান্তিনিকেতনে নিজের আস্তানায় একজন পরিচারকের সাহচর্যে শিল্পিত জীবন যাপন করে গেছেন তিনি। সেই জীবনে কোনো আড়ম্বর ছিল না। সব পেয়েছির দেশে পৌঁছানোর ছিল না সুতীক্ষ্ম বাসনা। ছিল পবিত্র মনে শিল্প সৃষ্টির তাগিদ। ছিল শিল্পকলা সম্পর্কে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য প্রবন্ধ রচনা করা।

তিনি ছিলেন আলোর জগতে অন্ধকারের প্রতিনিধি। শুধু সে যুগে নয়, এ যুগেরও অন্যতম ব্যতিক্রমী প্রতিনিধি।